বিষবায়ুর হ্রদ

– ঋতম দে, M.Sc., Ex-student

হাটবার। প্রয়োজনীয় ঘরোয়া জিনিসের কেনাবেচা চলছে বাজারে। তারই মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন। গ্রামের উত্তর প্রান্তের হ্রদটির দিক থেকে আজকেও বিকেলে চাপা গুড়গুড় এসেছিল। যেন হ্রদের দেবী রেগে আছেন। আর ক্ষুব্ধ হবেন নাই বা কেন। তাদের আগের মোড়ল মারা যাওয়ার আগে তার শ্রেষ্ঠ গরুটিকে দেবীকে উৎসর্গ করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তিন বছর কেটে গেলেও তার পরিবার তা করেনি। মোড়ল মশাইয়ের আত্মাও অসন্তুষ্ট হয়ে আছে নিশ্চয়ই। এই তো তিন-চারদিন আগেও এক অদ্ভুত জিনিস দেখেছিল তারা হ্রদে – সমস্ত হ্রদের জলের উপর বুদবুদ উঠছে। যেন তলা থেকে অতিকায় কিছু জেগে উঠে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তার গরম নিঃশ্বাসে জল ফুটছে যেন। ভয়ে সেই রাতেই গ্রাম ছেড়ে পালায় পঁচিশ জন। আজকের আওয়াজ গ্রামবাসীদের চিন্তা আরও বাড়িয়েছে। সমস্ত হাট জুড়ে তাই ছড়িয়ে আছে চাপা উত্তেজনা আর ভয় মিশ্রিত উৎকণ্ঠা।

দেখতে দেখতে রাত বেড়ে চলেছে। আটটা বাজলো। গ্রামে রাত তাড়াতাড়ি। অনেকে এরই মধ্যে রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছে। বাকিরাও শুতে যাবে আর কিছুক্ষনের মধ্যে। এই সময় এল আবার সেই আওয়াজ। কিন্তু না। এবার একটা গন্ধও। বারুদের গন্ধ। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। বাতাস কী? না, বাতাস নয়, বরং তার জায়গায় বাতাসের মতো অন্য কিছু দিয়ে গড়া একটা চাদর যেন সমগ্র গ্রামটাকে ঢেকে দিল। মানুষ আর পোষ্য গবাদীগুলো কিছুক্ষণ ছটফট করে অবশেষে স্থির হয়ে গেল। সব চুপ।

নিস্তব্ধ। মৃত্যুর চাদরে ঢেকে গেল বারোশো মানুষের বসতি নায়স গ্রাম। না, এটা কোনও রহস্য কাহিনির মুখবন্ধ নয় আদপেই। বরং এ আসলে বিরলতম এক প্রাকৃতিক বিভীষিকার সারাংশ মাত্র। সময়টা ১৯৮৬ সালের ২১ শে আগস্ট। পৃথিবীর বুকে এদিন ঘটে মানব ইতিহাসের লিপিবদ্ধ দ্বিতীয় ও শেষ 'লিমনিক ইরাপশন'। যে কোন ঘটনার বিবরণে স্থান-কাল ও পাত্রের সম্মিলন ঘটা বাঞ্ছনীয়। কালক্রম অচিরেই ১৯৮৬ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। আর পাত্রের সংখ্যা অনেক। মৃতের সংখ্যা শুধু এই একটি ঘটনাতেই ছিল প্রায় ১৭০০। মৃত্যু হয় অগণিত গবাদী পশুরও। অন্যদিকে স্থান হল ক্যামেরুন দেশে নায়স হ্রদ। ভূতাত্ত্বিকগত ভাবে এই হ্রদ গড়ে উঠেছে প্রাচীন আগ্নেয়গিরির মুখ বা ক্রেটার মধ্যে জল ভরে। তাই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হয় জলের তলার আগ্নেয়গিরি আবার জেগে উঠেছে। সেই সুপ্ত অগ্ন্যুৎপাত থেকে বিষাক্ত গ্যাস আসে পার্শ্ববর্তী নায়স গ্রামে এবং এই ভয়ংকর দুর্যোগ ঘটায়। পূর্ববর্তী আওয়াজ যা শোনা যায় তা নিশ্চয়ই সেই আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণেরই আওয়াজ। দুর্ঘটনার এক সপ্তাহ পর একজন আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি এসে বাতাস পরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলশ্রুতিতে বায়ুতে সালফার ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ইত্যাদি গ্যাস মেশে। প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে যে গন্ধের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে তাতেও বলা যায় বাতাসে SO_2 থাকা উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় পাওয়া যাচ্ছে বাতাসে গ্যাসগুলির মাত্রা নগণ্য। অর্থাৎ যতটা থাকার কথা তা নয়। কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি। তাহলে কী অগ্ন্যুৎপাত নয়। নায়স হ্রদ অতলে কী আরও গভীর কোন রহস্য? হতবাক বিজ্ঞানী শুরু করলেন আরও গভীর অনুসন্ধান, পরীক্ষা। তার রিপোর্ট অবাক করল সমগ্র বৈজ্ঞানিক মহলকেও। কি এমন ঘটনা যা অগ্ন্যুৎপাতের সামঞ্জস্য দেখালেও অগ্ন্যুৎপাতের প্রমান রাখে না। সারা বিশ্বে এমন ঘটনা আর আছে কী? হ্যাঁ আছে। একটিই। মাত্র দু বছর আগের। এবং কাছেই লেক মুনন। মিলিয়ে দেখলে দুইয়েরই ফলাফল এক। বিশেষত, উভয়ক্ষেত্রেই হ্রদের জল রক্তবর্ণ ধারণ করে। তীরবর্তী উদ্ভিদ সম্পূর্ণ রুপে নষ্ট হয়ে যায় এবং হ্রদের উপর সাদা মেঘের একটা আস্তরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্যস! আর কোনও অস্তিত্বই নেই এমন ঘটনার মানব ইতিহাসে। অতএব প্রায় দুইশতরও বেশি বিজ্ঞানী সম্মিলিত হলেন রহস্য সমাধানে। শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হল 'লিমনিক ইরাপশন থিওরি'। যেখানে বলা হল CO_2 সম্পৃক্ত হ্রদ থেকে গ্যাসের স্বয়ংক্রিয় বিস্ফারিত উদ্গীরণই হল এই দুর্যোগের কারণ। লেক নায়াসে একাধিক ছোটখাটো বিস্ফোরণের পর অবশেষে বড় বিস্ফোরণটি ঘটে ২১ শে আগস্ট রাতে।

বিস্ফোরণের তীব্রতায় সৃষ্টি হয় সুনামী যা তীরবর্তী উদ্ভিদকে নষ্ট করে। আর যে CO_2 নিঃসৃত হয় তা ভেসে আসে নীচের উপত্যকায় থাকা নায়াস গ্রামে। বাতাস অপেক্ষা ভারী বলে CO_2 নেমে আসে মাটির কাছে। গ্রামবাসীরা সেই বিষাক্ত বাতাস গ্রহণ করে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। স্বল্প পরিমাণ সালফার ডাই অক্সাইডও নির্গত হয়েছিল এই সময়। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণায় বোঝা যায় এই ঘটনা সব হ্রদে হতে পারে না; নায়াস ও মুননের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এই রকম ভয়ংকর সুপ্ত বিপদ লুকিয়ে রাখতে সক্ষম করে তোলে। এমনকি সব না হলেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত আরও কিছু হ্রদ আছে। তবে বিপদ কাটানোর উপায়? উপায় আছে। সময়ে সময়ে গ্যাস বার করে দিলেই গ্যাসের চাপ কমে যাবে। ফলে বিস্ফোরণ ঘটবে না আর। আবার আরেকদল বিজ্ঞানী উৎসুক হলেন এই রকম চাপের বিভিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করতে। সে গবেষণা এখনও চলছে। আর এখান থেকেই স্পষ্ট, প্রায় পাঁচ হাজার বছরের বিজ্ঞান চর্চার পরেও পৃথিবীর অনেক রহস্যই এখনও মানুষের অজানা। কবে কখন তার পর্দা উন্মোচন হবে, তা কে বলতে পারে?